মাটির প্রদীপ

—শ্রীবিভূতি চৌধুরী



—প্রাপ্তিস্থান—
প্রফুল্ল-লাইব্রেরী
৭১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রকাশ কোরেছেন

শ্রীশচীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রফুল্ল-লাইব্রেরী

৭১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম প্রকাশ

ফাল্গুন, ১৩[illegible]৭

বার আনা

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ

প্রকাশ প্রেস,

৬৬ নং, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

'মাটির প্রদীপ' জ্বালিয়াছেন আমার স্নেহভাজন শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ চৌধুরী। আজকালকার সহরবাসীর চোখ বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহারে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে মাটির প্রদীপের আলো আর তাঁদের চোখে লাগে না, কিন্তু আমরা পল্লীগ্রামের লোক ;—পল্লী-চিত্র আমাদের প্রাণে ভাবের ও রসের সন্ধান দেয়। তাই পল্লী-চিত্রের একটু নিদর্শন দেখতে পেলে আমরা আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে পড়ি। মাটির প্রদীপের স্নিগ্ধতা আমাদের প্রকৃতই আনন্দ দেয়,—স্মরণ করিয়ে দেয় সেকালের অনেক বিস্মৃত-প্রায় কাহিনী। তাই 'মাটির প্রদীপ' কাব্যখানি আকারে ছোট হ'লেও বেশ ভাল লাগ্ছে। একথা নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারি যে, লেখকের বয়স কাঁচা হ'লেও তাঁর লেখায় প্রকৃত কবিত্ব আছে, সে কবিতার ঝঙ্কারে প্রাণ সাড়া দিয়ে ওঠে।

তাঁ'র 'পূজার ফুল,' 'ব্যবধান,' 'উদাসিনী,' 'চাষার মেয়ে' 'ধ্রুবতারা' 'পরদেশীয়া' 'বনের মেয়ে' 'ঝড়ের সমুদ্র' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর কবি-মানসের নিখুঁত ছবি ফুটে উঠেছে। কয়েকটি কবিতার ছন্দোভঙ্গী ও শব্দ-সঙ্গীতের বিচিত্রতা আমাদের মন হরণ করতে পেরেছে। সাধনা করবার মত উপযুক্ত অবসর এবং সৌভাগ্য পেলে তিনি অদূর ভবিষ্যতে যে কবি-যশের অধিকারী হ'বেন তা' বেশ বলা যেতে পারে। অবশ্য তাঁর কবিতায় যদি কেহ ভাবের বিশেষ গভীরতা দেখতে চান, তবে তাঁ'কে নিরাশ হ'তে হবে—কারণ ও জিনিষটা তরুণ কবিদের কাছে এত শীঘ্র প্রত্যাশা করা যায় না। আশা করি অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাবের গভীরতাও বাড়বে।

—ছয়—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সুরের প্রতিধ্বনিও তাঁর বাঁশীর ঝঙ্কারে মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। এটাকে আমি গর্ব্বের বিষয় ব'লে মনে করি। কারণ এত বড় প্রতিভা-রবির আলোক যদি কোন কবিতায় না পড়ে তা' হ'লে বুঝতে হ'বে সে-কবির মন মুক্ত আলো-বাতাস নেবার সামর্থ্য পায়নি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-মন্দাকিনীর ধারা নানা ভাবে নানা কবির ভিতর দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু চাই আমরা সেই চিরন্তনী ভাব-ধারাকে নতুন ভাবে প্রকাশ করতে। শ্রীমান্ যে কাব্যের স্বপ্ন-লোকচারী তা' তাঁ'র কবিতা পড়ে বেশ বোঝা যায়। ভগবান করুন—রুক্ষ বাস্তবতার সঙ্গে যখন তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হ'বে তখনও যেন তাঁ'র কবিতা-লক্ষ্মী এমনই স্বপ্নের ভিতর মায়া-পুরী রচনা করতে পারে।

ফাল্গুন
১৩৩৭
কলিকাতা।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাস দুই হ'তে মনে করছিলাম আমার 'রাখী'র দ্বিতীয় সংস্করণ করবো, কিন্তু নানা কারণ বশতঃ তা'র পুনর্মুদ্রণ না ক'রে, ওর থেকে তিন চারটি কবিতা নিয়ে নতুন করে 'মাটির প্রদীপ' সাজিয়েছি। এর দু'একটি কবিতা ছাড়া প্রায় সব কবিতাই কোন-না-কোন কাগজে বেরিয়েছিলো।

এ বই প্রকাশ করা আমার পক্ষে দুরূহ হোয়ে উঠতো—যদি না সহৃদয় প্রকাশক অকুণ্ঠিত চিত্তে এর সকল ভার গ্রহণ কোরতেন; সুতরাং তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ বইয়ের প্রচ্ছদপটের রূপ দিয়েছেন আমাদেরই কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক সাহিত্য শ্রেণীর ছাত্র বন্ধুবর শ্রীশরদিন্দু সেনগুপ্ত। শেষের ছবিটি এঁকেছেন তাঁরই সহপাঠী বন্ধুবর শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র। তাঁদের কাছে আমি ঋণী রইলাম। 'মাটির প্রদীপে'র আলোর চেয়ে ছায়া হয়তো অনেক বেশী, তা'র বিচারের ভার আপনাদের উপর রইলো।

ফাল্গুনী-পূর্ণিমা
সাকপুরা—চট্টগ্রাম
১৩৩৭

—রচয়িতা—

মাটির প্রদীপ

—০:✲:০—

সন্ধ্যামণি

গোধূলির বেলা ঘনাইয়া এলো ওগো ও সন্ধ্যামণি !
খোল খোল এবে জড়িত আঁখির তন্দ্রার বন্ধনী।
পিয়াল ফুলের রাঙা উৎসবে নীলিমা গিয়াছে ভরি',
ডালিম দানার বিধুর বেদনা মেঘে মেঘে পড়ে ঝরি'।
তাহাদের পানে চেয়ে
নয়ন তোমার খোল একবার স্বপন-বিলাসী মেয়ে !
কার কথা তুমি ভাবিছ একেলা আজি সন্ধ্যার ক্ষণে,
রাঙা গোধূলির ফাগ-উৎসবে কাহারে পড়িল মনে ?
বন্ধ্যা উষার হারান স্মৃতিকি জাগিছে মর্ম্মে তব ?
তোমারে কি আজ হাতছানি দিল মরণ-মহোৎসব ?
সে তো গেছে মরে তার লাগি' কেন মুদিয়াছ দুটি চোখ?
শুক্লা চতুর্দ্দশীতে কে করে অমাবস্যার শোক ?
ওগোও সন্ধ্যামণি ! জানি তুমি সন্ধ্যাতারার মিতা,
কেমনে আজিকে ভুলিলে তাদের কহ মোরে বিস্মৃতা !

চাহ দুটি আঁখি মেলে'
ফাঁকা আকাশের ফাটলে ফাটলে কারা আজ শ্বাস ফেলে?
গোবি সাহারার শূন্যতা নিয়ে সুদূর তারার পাঁতি
বিস্মরণী গো! বল না কেমনে গোঙাইবে কালরাতি?
লাখ তারা আজ কাণ পেতে আছে হে ভোলা সন্ধ্যামণি!
শুনিতে তোমার মুদিত বুকের ফোটার প্রতিধ্বনি।
সন্ধ্যাতারারে হেরিতে যদিগো ব্যথা আসে বুকে ছেয়ে—
তবে আঁখি খোল তুলসী-মঞ্চে মোর দীপ-পানে চেয়ে।
মুদিত নয়ন মেলিয়া চাহ তো রাণি!
মাটির প্রদীপে ফুটিয়াছে কি না হারানো উষার বাণী।

ষোড়শ-বর্ষ

ষোড়শ-বর্ষের রম্য সুদুর্গম সুবঙ্কিম পথে,
সুদূরের পান্থ আমি অন্তহারা অতৃপ্তি উচ্ছ্বাসে
ছুটিয়াছি রাত্রি দিন আরোহি' এ'বিশ্ব-স্বপ্ন-রথে,—
ধরিত্রীর নভাঙ্গণ পূর্ণ মোর বক্ষের প্রশ্বাসে।

সিন্ধুর উদাত্তমন্ত্র, নির্ঝরের ঝর্ঝর সঙ্গীত,—
কলাপীর কেকাধ্বনি, বজ্রাগ্নির বিশ্বপ্লাবী শিখা
মোর যাত্রা-সহচরী, ক্ষণে ক্ষণে করিছে ইঙ্গিত,—
আঁকিছে ললাটে মোর সৌভাগ্যের জ্যোতির্ম্ময়ীটীকা?

যৌবনের পরপারে বাজে কার মঞ্জুল শিঞ্জিনী ?
গুঞ্জরিছে ঝিনি ঝিনি, বক্ষতলে উঠিছে স্পন্দন,
বিচিত্রা সে কোন্ নারী ? অন্তরের অনন্ত রঙ্গিনী
সে কি মোর ? তারি লাগি' অনাদি ক্রন্দন ?
মরীচিকা-ময়ী সে কি স্বপ্নে-গড়া মর্ত্ত্যের অপ্সরা ?
সঙ্গীত-ঝঙ্কারে মোর ছন্দসুরে নাহি দিবে ধরা ?

কৈশোর-শেষে

বিদায়, বিদায় আজি হে তরুণ কৈশোর আমার !
সান্দোল আনন্দ-স্বপ্ন পঞ্চদশ বৎসরের স্মৃতি প্রীতি তারুণ্যের গান
অবসান সব-ই অবসান !
তোমার সবুজ তটে বসি' রহি' প্রভাত সন্ধ্যায় আলোকে আঁধারে
চিনিয়াছি মোর কায়া, তা'রি ছায়া নবীন পাথারে
স্রোতটানে ভেসে গেছে মরণের রত্নাগার মাঝে ;
আজিকে বিদায়-দিনে সেই সুর বক্ষে মোর বাজে।
কত ছন্দ কত গীতি কত তান দুঃখ সুখ শুচিশুভ্র হাস্য কোলাহল
ধ্বনিয়া উঠিত মোর চিত্ততলে নিত্য অবিরল।

সৃষ্টির উল্লাস-স্বপ্ন তোমার আনন্দ চারু তীরে
হেরিয়াছি—হেরিতেছি আজো এই মরণের এপার ওপার,—
উদয়াস্ত দুই তীর অঙ্গুলি নির্দ্দেশে তব দেখায়েছ মোরে বার বার।
আয়ুর ভিখারী মৃত্যু-সাথে ওরে বন্ধু মোর! চিরদিন মিতালি আমার।
নগ্ন মরণেরে আমি জীবনের প্রতিক্ষণে রূপ দিব মসীর রেখায়,
সাজাইয়া যা'ব তারে স্ফূর্ত্ত হৃদে অক্ষয় শোভায়।

শোন আজি হে বন্ধু কৈশোর।
অজানা মাধুরী-ধ্বনি কর্ণরন্ধ্রে, তরঙ্গিছে মোর
শৈশব-বাসর মাঝে গুপ্ত তব অভিসার সম,
উঠিছে আনন্দ-রেশ চঞ্চল স্পন্দন অঙ্গে মম।
অধীর পুলক-স্বপ্নে শুনিতেছি অস্ফুট নিক্কণ,—
হেরিতেছি রম্যপুরী—জাগেতাই তনু মনে বিচঞ্চল কম্প্র-শিহরণ।
এ-পারের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-দুঃখ-সুখ গীতি-তান ছন্দ সুমধুর
ভুলে গেনু,—ও-পারের মায়াডাকে আজি মোর চিত্ত ভরপূর।
আরোহি' জয়-শ্রী-দীপ্ত শূন্য তব স্বর্ণ-শীর্ষ-রথে
বহুদূর আসিয়াছি রিক্ত মোর জীবনের সুদুর্গম পথে।
মল্লিকা-মঞ্জরী-রাখী পরাইয়া দাও করে আজিকার বিদায়ের দিনে,
বিচ্ছেদের অন্ধকারে হে কিশোর সখা তুমি লহ মোরে চিনে।
বিজয়ের ললাটিকা শুভ্র দীপ্ত ভালে মোর আজি দাও করিয়া অঙ্কন
ধন্য হো'ক তৃপ্ত হো'ক জীবনের পুণ্য প্রতিক্ষণ।

যৌবন-বসন্ত-সখা ষোড়শ বর্ষের কাণে কহে গেছে আমন্ত্রন-বাণী,
জানি আমি জানি
আজি মোর নিমন্ত্রণ ধরিত্রীর ফাল্গুনী-উৎসবে,
আমার যাত্রার পথে মিলনের শঙ্খধ্বনি কর তুমি ঘন ঘন রবে।
মোর অভ্যর্থনা-তরে সেথা কত মহোৎসব কত আয়োজন,—
অপ্সরা কিন্নরী কত স্বপ্নের আসর রচি' শ্লথকেশে করিবে নর্ত্তন;
স্বর্গের অমরা-সম দীপ-জ্বালা শুভ্রাসরে উঠিবে যে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আমার মরম-প্রান্তে মূরছিবে কি পুলক! চিত্ত-বীণা উঠিবে নিক্বণি'।
আনন্দ চটুল নৃত্যে কতসুরে বিদ্যাধরী মোর তরে করিবে বন্দনা,
শুনাইবে বিভোল মন্ত্রণা;—
রূপের পিয়ালা ভরি' রিক্ত করি সুরাপাত্র মোরে দিবে করিবারে পান,
নাহি পা'ব কভু পরিত্রাণ;
যৌবন আনন্দ-ভরে দিবে মোরে আলিঙ্গন তা'র,
নন্দন বনের শোভা সুরভি মন্দার গন্ধ সঞ্চারিবে অঙ্গেতে আমার।
উল্কা-শশী-গ্রহ-তারা-নীহারিকা নির্নিমেখে নিরখিবে মোর তনুখানি,
যৌবন-বিকাশ-শেষে কর্ণে মোর নিক্বণিবে নক্ষত্রের আয়ু-হীন বাণী।
যখনি ফুরায়ে যা'বে হাসি-নৃত্য কলগীতি আনন্দের চঞ্চল স্বপন,
জীবনের স্রোতটানে নাহি জানি কোথা যা'ব ম্লানাধরে বিষাদে তখন!

হে কৈশোর, হে বন্ধু কৈশোর!
ছিন্ন ক'রে দাও আজি তারুণ্যের সে বন্ধন-ডোর;
আবদ্ধ সীমার মাঝে বেঁধে আর নাহি রেখো মোরে,
অভিনন্দনের ডাক শুনিতেছি মায়া-স্বপ্ন-ঘোরে।

সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু হেরিতেছি মানসে আমার ;
বিদায়-গোধূলি-লগ্নে তোমারে কি দিয়ে যা'ব অর্ঘ্য উপহার ?
নহি কবি, নহি জ্ঞানী, অভিমানে সিক্ত নহে প্রাণ ;
রচিলাম ক্ষুব্ধচিতে তোমালাগি বিদায়ের বিক্ষোভিত গান।
মিলিব তোমার সাথে জন্মান্তরে ওগো বন্ধু, শৈশবের মরণ-শয্যায়,
আজি মোরে লহ চিনি, লহ মোর গীতি-মাল্য
বিদায়, বিদায়।

পূজার ফুল

কমল যখন মেলত আঁখি
রবির পানে চেয়ে,
ভোরের পাখী উঠত যবে
প্রভাতীসুর গেয়ে,
নিতুই এমন ভোর বেলাতে
সাজিটি তার নিয়ে হাতে
ফুল কুড়াতে আসত হেথায়
চৌধুরীদের মেয়ে।
কুঁড়িরা সব দুলত নেশায়
তার সে-পরশ পেয়ে।

পূজার ফুল

তুলত মেয়ে মালতী যুঁই
শিউলি ফুলদল,
না জানি কোন পাষান-দেবের
ঢাকতে পদতল।
চাইলে তাহার মুখের পানে
ফুটত হাসি অকারণে ;
[অই] কাল চোখের অতল দীঘি
করত ছলোছল।
তা'র সে-দেহে উঠত কেঁদে
ফুলের পরিমল।

অই কিশোরীর সাথে সাথে
আমিও ছল করে,
ফুল তুলিলাম কলাপাতার
সবুজ ঠোঙা ভ'রে।
আমার বুকের যতেক কথা
যতেক বেদন-আকুলতা,
ফুটত যেন অলির মুখে—
তাদের সোহাগ-স্বরে,
আমি—ফুল কুড়াতাম না জানি মোর
কোন দেবতার তরে।

নুইয়ে যখন দিতাম তারে
কনক-চাঁপার ডাল
আপনি হ'ত সরম-রাঙা
তা'র দুখানি গাল।
দুষ্টু হাওয়ায় বশ না মানি'
গোলাব-কাঁটায় বসন খানি
লাগত যখন,—অই কিশোরীর
উঠত ঘেমে গাল।
আমি—আঁচল খানি ছাড়িয়ে দিতাম
নুইয়ে গোলাব-ডাল।

বাগান-ধারের অই পুকুরে
ফুটত শত দল,
তাহার পানে চেয়ে মেয়ের
প্রাণ হ'ত চঞ্চল।
তখন আমি আদর করে
সুধাইতাম সেই মেয়েরে—
"চাই কি তোমার সূর্য্যমুখি!
অই সে নীলোৎপল"?
বলত সে যে "কাঁটার ঘায়ে
রাঙ্‌বে পদতল।"

পূজার ফুল

যাবার বেলা সাজিতে ত'ার
আমার তোলা ফুল
ঢেলে দিতাম নিঃশেষে সব
করেই যেন ভুল।
বল্‌ত সে যে থাকি থাকি'
"দেব্‌তারে হায় দিচ্ছ ফাঁকি—
এই নিখিলে নেই কোন পাপ
তাহার সমতুল।
অভিশাপের বইচো বোঝা
নিতুই করে ভুল।"

সেই ভুলেরই রয়েছে মোর
আজকে প্রয়োজন,
তাতেই জানি মোর দেবতার
তুষ্ট রহে মন।
লো কিশোরি! দেব্‌তা আমার
নয়ক পাষাণ—তাই বারে বার
আমার তোলা কুসুম মাগে
তোমার শ্রীচরণ।
তোমার মাঝে দেবতা মোর
রাজেন অনুক্ষণ।

———

বনের মেয়ে

ওগো ও কিশোরী শ্যামলী বনের মেয়ে !
বিস্ময় মোর লাগে দুনয়নে তব মুখ পানে চেয়ে।
অঙ্গে তোমার কী অরূপ জ্যোতি কিবা অপরূপ সাজ
মনে হয় তুমি মায়াকাননের মমতার মমতাজ।
কত সুন্দর তব দেহখানি কত সুন্দর হাসি,
তোমারে হেরিয়া পরাণ আমার উঠে আজ উচ্ছ্বাসি'।
কেতকী-রেণুর অমল সুষমা গোপনে হরণ করি'
কে রাঙাল অই সোণামুখ তব হে শোভনা সুন্দরী ?
তোমারে সুধাই অয়ি নাম-হারা ফাগুন-পরীর রাণী,
গৌরী চাঁপার নির্য্যাসে বুঝি মাজিয়াছ দেহখানি ?
করবী-গুচ্ছ কবরীরে তব করিতেছে বেয়াকুল,
কর্ণে তোমার ঈষৎ দুলিছে ঝুম্‌কো লতার ফুল।
সেফালী কুসুম-মালা
হার হয়ে তব কণ্ঠে দুলিছে হে কিশোরী বনবালা !
কম করে তব পরিয়াছ তুমি মাধবীর কঙ্কণ,
কল্‌মী লতারে করিয়াছ তব ক্ষীণ কটি-বন্ধন।
দুটি ঠোঁট তুমি রাঙায়েছ মেয়ে মেহেদি ফুলের রসে,
মৌমাছি তোমা পীড়ন করে না ও রাঙা অধরে বসে'

ওগো অজানিতা! চপল তোমার আঁখির চাহনি-ছায়া।
মাগে নাকি কোনো ভোলা পথিকের গোপন চাওয়ার মায়া?
বন-বীথিকার ছায়াতলে রহি' সিতপূর্ণিমা রাতে
কলঙ্কিনী সে চাঁদের স্বপন হেরিয়াছ আঁখি-পাতে?
হে বন-বাসিনি! গেরুয়া তোমার আঁচল-প্রান্ত ধরি'
কহেনি কি কভু চইতের হাওয়া 'আহা আহা মরি মরি'!
শতদল সম তব দেহ হেরি কহ ওগো সুন্দরী
শিহরি ওঠেনি মদালসা সেই মহুয়ার মঞ্জরী?
তব কায়া যেন মায়াবী রূপের কারা,
তারই মাঝে আজ বন্দিনী এই কবির আঁখির তারা।
তরু-আলবালে ঢালিতেছ বারি নিভাতে তাদের দাহ,
এই পথিকের ব্যথা-মরু-বুকে হ'তে পার বারিবাহ?
ওগো বনপাখি, তোমার পাখার একটি পালক লাগি'
আমি আসিয়াছি এ শ্যাম কাননে পথে পথে রাত জাগি।
কি নামে তোমারে ডাকিব জানি না হে কিশোরী অনামিকা,
বনের হরিণী জানি তুমি—নহ সাহারার মরুশিখা।
বনেরই শ্যামল:সুষমা রয়েছে জড়ায়ে তোমার দেহ,
তব নয়নের তারা মাঝে আমি হেরি কাননের স্নেহ।
ঘন তরুমায়া ঘনায়েছে অই কমনীয় তনু' পরে,
আজ হ'তে আমি ডাকিব তোমারে বনছায়া নাম ধরে।

উদাসিনী

গাঁয়ের মেয়ে চলেছে অই কমল-দীঘির বাঁকে
অলস পদে কলস খানি লয়ে কোমল কাঁখে।
কি নাম তাহার জানিনে—আর বয়েসটি তার কত,
মুখটি তাহার আধেক-ফোটা সূর্য্যমুখীর মত।
অঙ্গে যেন হাসছে চাঁপা উজল মনোরমা,
দীঘল কেশে ঝুরছে তাহার কৃষ্ণারাতির অমা।
বিষের মায়া জড়িয়ে আছে তা'র সে নীলাম্বরী,
সে যেন ঠিক রূপকথারই নাম-না-জানা পরী।
রূপের স্বপন দেখে তাহার কাজল কাল অলি,
তা'র সে-চরণ-ছোঁয়ায় ফোটে ভূঁই চাঁপাটির কলি।
পথের কেয়া শিউরে ওঠে তাহার পানে চেয়ে,
চৈতী-হাওয়া গুমরে মরে তার সে-পরশ পেয়ে।
আমের শাখে লুকিয়ে থাকে কোকিল অনুখন,
শুনবে বলে অই কিশোরীর চুড়ীর কন কন্।

দীঘির ঘাটে নামল বালা রাঙা চরণ ফেলি',
তার পানে আজ চাইছে শুধু কুমুদ আঁখি মেলি।
চরন দুটি ডুবিয়ে জলে বসল মেয়ে ধীরে
দীঘির ঘাটে,—কলসটারে ভাসিয়ে রাখি নীরে।

তার সে রূপের পরশ পেয়ে কমল দীঘির জল
ঈষৎ যেন শিউরে উঠে করল ছলোছল।
দীঘল কাল অলক তাহার আজকে ক্ষণে ক্ষণে
চাইছে যেন কইতে কথা চৈতী হাওয়ার সনে।
রূপটি যে তার তীরের মত বিঁধতে পারে দিল্,
তাই বুঝি আজ মরছে ঘুরি মাছরাঙা আর চিল।
কতই কথা ভাবছে মেয়ে সলিল পানে চেয়ে,
তাহার মাঝে আপন ছায়া দুলছে সোহাগ পেয়ে।
আজ যেন সে বড়ই একা বুকটি শুধুখালি,
অঙ্গে তবু করছে খাঁ খাঁ রূপের চোরাবালি।
জল নিতে আজ এসে মেয়ের উদাস হল মন,
হায় না জানি পেল সে কোন কালার দরশন!
নীর-মুকুরে হেরছে আজি কিশোরী তার ছায়া,
কলস তাহার ভাসিয়ে নিল গহীন জলের মায়া।

হঠাৎ মেয়ে দেখল চেয়ে বাঁধা ঘাটের পাশে
গাগরী নেই—সে যেরে অই মাঝ-দীঘিতে ভাসে।
কমল-কাঁটার কোমল ঘা'য়ের পরশখানি আজ
গোপন ক্ষত আঁকল কত তার সে বুকের মাঝ।
কলস পানে চেয়ে মেয়ে বললে হতাশ ভরে:
"কেমন করে ফিরব আজি শূন্য কাঁখে ঘরে"!

ওগো ওগো সোণার মেয়ে ভয় রেখো না মনে,
হুতাশীশ্বাস ফেলছ কেন আজকে অকারণে ?
হৃদ-গাগরী ভাসিয়ে দিলাম তোমার রূপের নীরে,
সেই কলসে জল ভরে আজ যাওলো ঘরে ফিরে।

জংলী

'পাগলী' ব'লে 'জংলী' বলে জেনীরে সব গাঁয়ের মেয়ে
ঠাট্টা করে দিন রজনী—তাদের মুখের পানে চেয়ে
ফিক্‌ফিকিয়ে হাসে জেনী,—যদিও সে নয়ক সোণা,—
নয়ক মাণিক-ফুল অথবা দামী হীরের জড়ির বোনা।
জংলী স্থরে কয় কথা সে—পাগলামি তার সবকিছুতে,
সবাই যদি এগিয়ে চলে রয় পড়ে সে ঠিক পিছুতে।
দল বেঁধে সে পুকুর ঘাটে যায়না পাড়ার মেয়ের সাথে,
কাঁকন চুড়ী পরে না সে শ্যামল দুটি চিকণ হাতে।
গিণি সোণার হারের কাঁটা অই বুকে তার দেয় গো জ্বালা,
তা'র কাছেতে অধিক দামী শিউলী ফুল আর পুঁতির মালা
বিনিয়ে কভু বাঁধে না সে দুলিয়ে পিঠে দীঘল বেণী,
তাইতো গাঁয়ের মেয়ের চোখে বিষ হয়েছে জংলী জেনী।

চোদ্দ বছর পেরিয়ে গেছে বয়েস এখন তা'র পনরো,
তবুও সে মাথায় বুকে আঁচল টেনে দেয় না বড়।
দেখলে পথিক ভিন্ গাঁয়েরই অবাক চোখে দাঁড়িয়ে থাকে,
তাই দেখে সব পাড়ার মেয়ে ঠাট্টা করে জ্বালায় তাকে।
এখনো তা'র চোখে মুখে ঝুরছে চপল চঞ্চলতা,
পায়নি যেন আজো সে হায় যৌবনেরই নীলবারতা ;
আলতা পায়ে পরে না সে—পুঁইয়ের গোটার রস নিঙাড়ি'
চরণ হু'টি রাঙায় জেনী—আর সে নতুন ডুরে সাড়ী।
বাদ্‌লা-দিনে ভিজতে সে যে বড়োই যেন ভালোবাসে,
তার সে-হাতের ছোঁয়া পেয়ে কদম-কুঁড়ি মুচ্‌কি হাসে।
রামধনুকের সাতটি রঙই তা'র চোখে যায় উঁকি মেরে,
বিজ্‌লী-বাতি জ্বালায়ে মেঘ পাগলী মেয়ের রূপটি হেরে।

'জংলী' তারে যতই বলুক পাড়া গাঁয়ের মুখর মেয়ে,
মুখখানি তা'র দেখলে আসে আনন্দে মোর বুকটি ছেয়ে।
বীণাপাণির বোলটি আমি তা'র সুরেতে শুনতে পাই,
বুকের শিরা কাঁপায় আমার জংলী সুরের ভঙ্গিমাই।
পাগলী বলে জংলী বলে যতই তারে করুক হেলা,
তারেই নিয়ে মাটির ঘরে গেঁয়ো কবির প্রাণের খেলা।

অসময়ে

জীর্ণপাণ্ডু পউষের বুকে অকালে এলোরে আজ
মর্ম্মের কোষে প্রাণ-রসভরি' নববসন্ত-রাজ।
কী যেন বারতা এনেছে সে বহি'
ধরনীর কাণে যাবে তা'রে কহি'—
দিবে সে ঘুচায়ে শিশিরের অই ম্লান শূন্যতা-লাজ,
নিঃস্ব তরুরে অকালে পরাবে রাঙা যৌবন-সাজ।

পউষের যত শীর্ণতা দিল ফাল্গুন আজ ঢাকি',
নগ্নতা আর বিদ্রূপ তা'রে করিবে না থাকি থাকি'।
চেয়ে দেখ ওরে চম্পার ডালে,
নটীসম ফিঙে নাচে তালে তালে,
অসময়ে যেন শাখে শাখে আজ কুহরি উঠিছে পাখী
পউষের যত দীনতা দিয়াছে অকাল ফাগুন ঢাকি'।

উড়ো বসন্ত অতনু-স্বপন হেরিতেছে বসে বসে,
প্রকৃতির স্তন ফাটিয়া পড়িছে মধু উচ্ছলরসে।
কোকিলা দিতেছে আজি অকারণ
কোকিলের মুখে শুধু চুম্বন,
ভ্রমর ভ্রমরী করে গুঞ্জন পুষ্প-মর্ম্মে প'শে,
উদ্বেল আজ প্রকৃতির বুক মধু উচ্ছলরসে।

দক্ষিণা অই দীন পউষের কুয়াসার গুণ্ঠন
টুটিয়া ছিঁড়িয়া চাহিছে কি যেন করিবারে লুণ্ঠন।
শিশিরের চিরনগ্ন ছু'পায়ে
সে চাহিছে দিতে নূপুর পরায়ে,
বক্ষেতে তা'র বাঁধিবারে চায় কাঁচলীর বন্ধন,
বাসনা তাহার রিক্তেরে দিতে অনন্ত যৌবন।

হঠাৎ নিঃস্ব বালিকা পউষ বসন্ত-সাড়া পেয়ে
ষোড়শী সাজিয়া উঠিছে আজিকে সৃজনের গান গেয়ে।
উরসে তাহার রূপ-দেবতার
ক্ষুধিত আত্মা করে হাহাকার!
শতদল সম সে আছে বিধুর সূর্য্যের পানে চেয়ে।
তারই ছায়া হেরি মাটির মর্ম্মে বেদনা আসিছে ছেয়ে॥

পউষের বুকে ফাল্গুন অই ছড়াল স্বর্ণপাখা,
পুষ্পিত হয়ে উঠে দিকে দিকে মৃতমঞ্জরী শাখা।
কে তোরা বালিকা দখিণা-স্পর্শে
চিরদুরন্ত ষোড়শবর্ষে
পা বাড়ালি ওরে—উন্নত বুক আঁচলেতে দেরে ঢাকা।
অসময়ে এলো বসন্ত আজ ছড়ায়ে স্বর্ণপাখা॥

পরিচয়

ওগো ও অজানিতা কিশোরী সোণামেয়ে।
একেলা কোথা যাও আপন মনে গেয়ে ?
জানিনে তব নাম তোমারে নাহি চিনি,
এ পথে কোন গাঁয়ে চলেছ বিদেশিনি ?
দিবস নিশি হেথা আমি যে বসে থাকি,
কভু ত হেরিনিক ও দুটি কালো আঁখি।
হেরেছি এ নয়নে কিশোরী রাশি রাশি,
তাদেরই ও-মুখে তো হেরিনি সোণা হাসি ?
ও এলো কুন্তলা ! চলেছ কোন গাঁও—
সুদূর কোন হাটে আমারে বলে যাও।

কিশোরী মেয়ে ওগো আধেক-ফোটা কলি
চলিছ কেন হায় ঝরা সে-ফুল দলি ?
ও-ভুঁই চাঁপাটিরে চরণে গেলে ছুঁয়ে,
সরমে শিহরিয়া পড়ে সে নুয়ে ভুঁয়ে।
তোমারে জানাইছে যূথিকা তা'র নতি,
নাগকেশর-বুকে কাঁপিছে প্রজাপতি।

অলিটি গুঞ্জরে 'দখিণা জোরে বও';
পাখিটি কুহরিছে "বউ কথাটি কও।"

ওগো ও সুন্দরী রূপসী সোনা মেয়ে!
পাগল হ'ল সবে তোমারই ছোঁয়া পেয়ে।
ও তব কায়া যেন মায়াবী রূপ-কারা,
বাঁধিলে সেথা মোর এ দুটি আঁখি-তারা।
তোমার পদ রাগে রঙিন্ হল ধূলি,
তাহারই সাথে মোর পরাণ গেল খুলি।
মিনতি করি তোমা' হে মিতা স্নেহলতা!
এ কবি-সনে আজ কহগো দুটিকথা।

রূপের ছোঁয়া দিয়ে দিলে গো যদি খুলে
মরম-নির্ঝরিণী চলার ক্ষণে ভুলে,—
শুনিয়া যাও তবে পাতিয়া দুটি কাণ
আমার পরাণেতে সোঁতের কলতান।
আমারই এই বুকে বহালে যদি তুমি
শীতল বারিধারা প্লাবিয়া মরুভূমি—
তবে সে-স্রোতমাঝে ওগো ও রূপ-রাণি!
সোহাগে যাও ধুয়ে রঙিন্ পা'দুখানি।
তাহারই পরশনে উতল ছলছল
সলিলে ফুটিবে গো অরূপ শতদল।

আজিকার বিনু সেইদিন ছিল নাহি-ফোটা ফুলকলি,
তা'র সে বুকের গন্ধে তখনো উড়িয়া আসেনি অলি।
বালক-বালিকা ছিলাম আমরা দু'জনে দোঁহার সাথী,
ধূলোতে গড়িয়া খেলা-ঘর মোরা কাটায়েছি দিবারাতি।
গাছের আগায় উঠিত যখন সোণালী সে রোদ্দুর,
ঘরের চালেতে ময়না যখন তুলিত প্রভাতী সুর—
সে সময় ভেঙে দিয়ে যেত ঘুম বিনু মোর ঘরে আসি',
চোখ দুটি তা'র দেখাত তখন বড় মিঠে হাসি হাসি।
চৌধুরীদের বাগানে দু'জনে তুলিয়াছি কত ফুল,
কাঁঠালি-চাঁপার গন্ধে করিত দু'জনারে বেয়াকুল।
পদ্মপুকুরে সাঁতার কেটেছি শত ঢেউ তুলে জলে,
হারিয়ে যেতাম দু'জনেই কভু ডুবে সে সলিল তলে।
আজিকার মত সরম তখন ছিলনাক ও নয়নে,
যেতনা তখন লতাটির মত ভূঁয়ে নুয়ে অকারণে।

এই বিনু যবে ছিল গো কিশোরী কিশোর ছিলাম আমি,
বাঁধা খোঁপা তা'র খুলে দিয়ে তা'রে রাগায়েছি দিবাযামী।
প্রজাপতির সে ডানা ছিঁড়ে তা'র কপালে দিয়াছি টিপ,
দেয়ালির রাতে এক সাথে মোরা জ্বালায়েছি শতদীপ।
আমের শাখাতে ঝুলন ঝুলেছি মুখোমুখী দুইজনে,
ফাগ-উৎসবে হোরী খেলা কত খেলেছি বিনুর সনে।

তখন সে জানি ছিলনা এমন পালাতনা মোরে হেরি',
চরণে তাহার সেদিনও বাজেনি হেন লজ্জার বেড়ী।
চোখ দুটি তা'র ছিল চঞ্চল ভীরু কপোতের মত,
অকারণে বিনু হাসিত বলিয়া চাপড় খেয়েছে কত।
রাগ অভিমান চলিত তখন—দু'জনে ঝগড়া করি'
কাটায়েছি হায় মোরা দোঁহে কত ব্যথা-ভরা বিভাবরী।
সেই বিনু আজ মোর সাথে আর কহেনাক দুটি কথা,
বেড়ার আড়ালে মুখটি লুকায়ে বাড়ায় বুকের ব্যথা।
সাঁঝের বেলায় এবে যদি কভু হেরে মোরে বিনুরাণী,
ছুটিয়া পালায় ফুঁ দিয়ে নিভায়ে সন্ধ্যা-প্রদীপখানি।
পুকুরের পারে হঠাৎ যদিবা দেখা হয় তার সনে,
মাথা নীচু করে আঙুলটি বিনু জড়ায় বসন-কোণে।
চোখে চোখে এবে চাহিতে পারে না সেদিনের মত আর,
বাঁধিয়াছে আজি ষোড়শী বিনুরে সরমের কারাগার।
গোকুল ছাড়িয়া আসিয়াছে সে যে মায়াবী মথুরাপুরী,
কৈশোর-স্মৃতি কেঁদে উঠে হেথা মোর শূন্য বুক জুড়ি'।

চাষার মেয়ে

সোণার ধানে ভরেছে আজ অই সে কাজীর বিল,
উড়ো তোতার পাখ্‌না সেথায় কর্‌ছে ঝিলিমিল্‌।
বাউরী বাতাস তার বুকে আজ তুল্‌ছে কেবল ঢেউ,
এমন ফসল এই গাঁয়ে আর দেখেইনিক কেউ।
ভর্‌বে এবার কানায় কানায় মোনা কাজীর গোলা,
করতে হবে উঠানখানি একটু আরও খোলা।
গাছগুলি আর সইতে নারে পাকা ধানের ভার,
তাই কি ক্ষেতে পড়্‌ছে তা'রা নুইয়ে বারেবার ?

অই বিলেতে ধান কাটিছে এই গাঁয়ের এক চাষী,
একটি মেয়ে সঙ্গে—তাহার মুখটি হাসিহাসি।
ফুরিয়ে দিতে কাজটি বাপের কাস্তে লয়ে হাতে
ধান কাটিতে সেও এসেছে অই সে চাষীর সাথে।
গেঁয়ো চাষার মেয়ে—তবুই দিয়ে রূপের ছাপ
দেব্‌তা যেন দেছেন তা'রে দারুণ অভিশাপ,
শক্ত করে বেঁধে বুকের আল্‌গা কাপড়খানি
কৃষাণ-বালা ধর্‌ল পাকা ধানের গোছা টানি'।

মাঘের হাওয়ায় উড়্‌ছে তাহার চিকণ কালো চুল,
কাণেতে তার দুল্‌ছে কেবল রূপোর দু'টি দুল।
ঝাঁঝাল রোদে গাল দুটি তা'র উঠ্‌ছে ঘেমে খালি,
মুখর খাড়ু তাই দেখে হায় পাড়্‌ছে কত গালি।
কোমরখানি নুইয়ে দিয়ে গেয়ে ফুলেল গান,
চাষার মেয়ে কাস্তে দিয়ে আস্তে কাটে ধান।
তা'র সে হাতের পরশ পেয়ে 'গিরিং' ধানের শিষ
কি যেন কয় মনের কথা গোপনে ফিস্‌ফিস্।
নিশাস্ তাহার যখনি যায় তাদের কায়া ছুঁয়ে,
আপনি হ'তেই পড়ে তা'রা চরণে তা'র নুয়ে।

চাষার মেয়ে আন্‌মনেতে গান গেয়ে যায়
দিগ্‌-বিধবার আঁচল করে দিগন্তরে ধূ ধূ
মেঠো সুরের সে গান শুনে উড়ো বকের সারি
অবাক চোখে চায় মেয়েরে দুধ-মাখা পাখ নাড়ি'।
মাঘের রউদ ঝিমায় যেন তাহার পানে চেয়ে,
হেথায় শুধু আফ্‌শোষে মোর বুকটি আসে ছেয়ে।
কৃষাণ-মেয়ে কাস্তে দিয়ে আস্তে কাটে ধান,
সেই আঘাতে পরাণটি মোর হয় যেন খান খান।

কি গান গাহে অই মেয়েটি বুঝ্‌তে পারি না যে,
সুরখানি তা'র শুন্‌লে শুধু হিয়ায় ব্যথা বাজে।

নেইক জানি অই কিশোরী কি-ই বা যায় বকে,
ব্যথার কাজল এখনও তো লাগেনি ওর চোখে।
এ যেন ঠিক হৃদয়-ছ্যাঁচা ব্যথায় গলা স্থর,
রয়েছে তা'র আধেক-ফোটা বক্ষে ভরপূর।
হয় তো কোন বেদন আছে তা'র সে-বুকে ঢাকা,
সুখের গীতি নয়তো কভুই এমন মধু-মাখা।
হয়তো দেহে নাম্‌ছে রূপের শাঙন বেয়াকুল,
শিহরি' তাই উঠ্‌ছে গো তার বুকের কদমফুল।
হয়তো মেয়ে একটু পেয়ে কস্তূরী-সন্ধান
গাইছে আজি গন্ধে-ব্যাকুল ছুটে চলার গান।

লো কিশোরী! কৃষাণ-বালা, গান গেয়ে যাও তুমি,
সুরের সুরধুনীর ধারায় আমার মরুভূমি
দাওগো মেয়ে দাও ডুবিয়ে—এই পথিকের কায়া
মাগছে আজি দূর হতে অই তোমার সুর-ছায়া।
গানের তানে দাও ভাসিয়ে গিরিংধানের বিল,
অই রেশে তার উঠুক ভরে দেউলিয়া মোর দিল্।
চাষার মেয়ে! ধান কেটে যাও তা'র সাথে গাও গান,
উঠুক কেঁপে সেই গানে এই গেঁয়ো কবির প্রাণ।

বালুচর

ওই যেখানে করছে খাঁ খাঁ চোরাবালুর চর,
নিশায় যেথা ফুঁপিয়ে উঠে চক্রবাকীর স্বর ;
তপ্ত যাহার অঙ্গখানি
আছে ঘেরি' গাঙের পানি,
মাছরাঙা আর গাঙ্‌চিলেরা উড়ছে যাহার 'পর,
সেইখানেতে বাঁধ্‌নু আমি আমার খেলা-ঘর ॥

ঊষর ধূ ধূ সেই চরেতে নেইক তরু-ছায়া,
সেথা—রোদের তাতে জাগায় শুধু মৃগতৃষার মায়া।
দুপুর যখন সেথায় আসে
বিধুর বায়ু উছলে হাসে,
তার সে ছোঁয়ায় শিউরে উঠে দিগ্‌-বিধবার কায়া
সাগর-ঘেরা সেই চরেতে নেইক তরু-ছায়া ॥

ঘুম ভাঙে না সেথায় কভু ঘুঘুর ডাকে হায়!
সেথা—ঘুঙুর শুধু গুমরে মরে গাঙ-নটিনীর পায়!
ঘূর্ণী হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
বালুচরের বুকটি জুড়ে
ধূসর বালি শুধুই উড়ে অথির বেদনায়,
শঙ্খ-চিলের পালক ঝরে সেথায় ঝড়ের ঘায়।

সেই সে বালুর চরে তবুই বেঁধেছি মোর ঘর,
আমায় ঘেরে রয়েছে অই শূন্য দিগন্তর।
গাঙের পানি সে-চর ঘিরে
তরঙ্গে দোল খাচ্ছে ধীরে,
ভাঙতে সে চায় বাঁধনটিরে হানি' ঢেউয়ের কর,
সলিল-ঘেরা বালুর চরে বেঁধেছি মোর ঘর।

আমি—বালির বুকে হাতড়ে ফিরি হারা-মাণিক মোর,
যা'র লাগি হায় কেঁদে কেঁদেই নিশায় করি ভোর।
ভাঙন-ভরা শাঙন রাতে
বাঁশি শুধুই লয়ে হাতে
আগুনে মোর চখীর সাথে ঝরাই আঁখি-লোর্।
বালুর বুকে হাতড়ে ফিরি হারা-মাণিক মোর।

উড়োপাখীর ঝরা-পালক কুড়োই নিশিদিন,
কখন শুনি মাছরাঙ্গারি সুরের রিণিঝিন্।
গাঙ-চিলেরে হায় না জানি
শুধাই কত অবোধ বাণী—
পাখ্‌নাখানি উড়িয়ে সে যায় শূন্যে হয়ে লীন,
এমনি ক'রে যায়গো কেটে আমার নিশিদিন।

বোঝাই করা নায়ের মাঝি দেয়গো যবে পাড়ি,
তাহার পানে চেয়ে চেয়ে চোখ দুটি হয় ভারি।
পালতোলা সেই নায়ের মাঝে
খুঁজিগো হায় সকাল সাঁঝে
হারিয়ে-যাওয়া সেই সাথীরে ঝরায়ে আঁখ্-বারি;
যার লাগিয়ে হলাম আজি বালুর মরুচারী।

ভাঙবে কখন নেইক জানি এই সে বালুচর
রুদ্র নেশার ঘূর্ণী হাওয়ায় ঈশান কোণের ঝড়।
ভয় বা কিসের ? রে বিবাগী !
কূল যে রে তোর গেছেই ভাঙি,
একূল ওকূল যাক্‌না ভেসে—অকূল হবে ঘর।
রে কবি ! তুই ছাড়িস্‌নে এই চোরাবালুর চর॥

পথের কেয়া

পথের কেয়া ! পথের কেয়া !
শাঙন প্রাতের অপ্সরী !
বাদ্‌লা-রাণীর পর্শনে আজ
ফুটলি কি তুই সুন্দরী ?

ঊর্দ্ধে বাজে মেঘ-ডমুরু
বুক যে রে তোর দুরু দুরু—
পড়ল কি আজ অই মুখে তোর
ইন্দ্রধনুর রঙ্‌ ঝরি ?

কৃষ্ণ অলি-লাঞ্ছিতা গো !
কোন অতনুর নিশ্বাসে
উঠলি জাগি কাঁটার বুকে
রোমাঞ্চিত উচ্ছ্বাসে ?

বলনা সখী এমনি করে
কাঁচ্‌লি বাঁধি' বক্ষ'পরে
হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলো তুই
কাটিয়ে দিলি কার আশে ?

পথের কেয়া

আকাশ বাতাস উন্মনা আজ
তোর সে-বুকের গন্ধেতে,
সুর তুলে সে গেঁয়ো-বধূর
বুকের বাঁশির রন্ধ্রেতে।

ডাহুকী তা'র ছোঁয়া পেয়ে
ঝিমায় লো তোর মুখটি চেয়ে—
কৃষাণ-বালা থমকি দাঁড়ায়
উদাস চোখে পথ যেতে।

তোর সুবাসের ছন্দ আঁকে
চক্ষে ঘুমের আল্‌পনা,
অঙ্গে যে তোর লাখ কিশোরীর
সোণা হাসির জালবোনা।

জেগে জেগে তাইতো রাণি!
দেখি তোমার স্বপনখানি,
উদাস করে মর্ম্ম আমার
তোমার সুরের মূর্চ্ছনা।

মউমাছি গায় বাউল-গীতি
তোমার রূপের অঙ্গনে,
রেশমী কেশর কয়লো তাদের
"মোদের তোরা সঙ্গ নে।"

আজ বুঝিনু কেনই খালি
পরাণ তারা দেয় গো ডালি,
কাঁটার রাশি, চরণে তোর
রূপ-সরাবের ঘূর্ণনে।

গৌরী কেয়া! গৌরী কেয়া!
কাঁটায়-ফোটা ফুলরাণি!
তোর বুকে আজ রূপ-দেবতা
দিচ্ছে আমায় হাতছানি।

কি অঞ্জলি তা'র চরণে
দিয়ে যাব চন্দ্রাননে
নেইক জানি,—গেলাম শুধু
প্রেমের নতি আজ দানি'।

সূর্য্যমণি

জীর্ণপাণ্ডু পউষের গোধূলির ম্লানচ্ছবিখানি
বিচ্ছেদ-বিধুর শীর্ণ আপনার বিম্বাধরে টানি'
কম্প্রবক্ষে নিলে তুমি সূর্য্যমণি! বিরহের তিমিরের তীরে।
কজ্জ্বল-বরণাস্মিতা সন্ধ্যাসতী বিশ্বে ধীরে ধীরে
নেমে আসে স্বপনের মত;
ঝিল্লিরা তুলিছে তান, ভৃঙ্গদল গুঞ্জনে বিরত।
ক্ষের বল্লভ তব পশ্চিমের অস্তাচলে গেলো মৃদুহাসি';—
মৃদুল পূরবী-হাওয়া উদাস মানস-তলে
বাজাইছে বিচ্ছেদের বাঁশি।
দূর অনন্ত হ'তে মরণের বার্ত্তা তব সন্ধ্যারাণী তমিস্র লগনে
বিক্ষুব্ধ বিভোল প্রাণে বহিয়া এনেছে,—তাহা কহে যায়
তোমারি শ্রবণে
নিকুঞ্জ বিতান-তলে আপনার বৃন্তমাঝে বিভাসিত হয়েছিলে অয়ি!
প্রস্ফুট যৌবনে তব তোমার সুরভি গন্ধ বিলাইল হে সৌন্দর্য্যময়ী
মদির চঞ্চলানিল স্ফূর্ত্ত প্রাণে মত্ত চারিভিতে,
তৃষাতুর ভৃঙ্গরাজি হে বিহ্বলা গুঞ্জরণ-গীতে
কম্প্রবক্ষে বরিল তোমারে,
প্রভাতের স্নিগ্ধ অভিসারে।

বিলাসিনি, হায়,
মৃত্যুর সায়াহ্নে তোমা' আজি তা'রা ফিরে নাহি চায়।
নিষ্ঠুর বধিরকাল ক্রূর হাসি' রহি' অন্তরালে
চুম্বিছে ক্ষুধিত শ্বাসে দীপ্ত তব আরক্তিম ভালে।
জীবন-দীপিকা-শিখা নির্ব্বাণ খুঁজিছে আজি—
নিবে যায় অই নিবে যায়,
হে সুন্দরী সূর্য্যমণি, হায়!
নিঃশব্দ অস্ফুট ভাষে পাংশু তব বিম্বাধর খানি
বিচঞ্চল মারুতের কর্ণ-রন্ধ্রে কহে যায় অতীতের কোন স্বপ্ন-বাণী?
বিরহ-বিহ্বলা অয়ি, বক্ষ-হিল্লোলিনী মোর উচ্ছ্রিয়া উঠিছে ক্ষুব্ধবাতে,
দুঃসহ বেদনে তব, অশ্রুম্লান কায়া আজি, কপোল আপ্লুত ধারাপাতে।
তোমার হিয়ার সাথে মিশে গেছে আজি মোর প্রাণ,
তাই বুঝি শ্রান্ত বক্ষে উঠে রণি' বিদায়ের বিক্ষোভিত গান!
সুরভি নিশ্বাস তব মিশে যায় অনাদ্যন্ত নীলব্যোম-মাঝে,
পাণ্ডু তব ঝরে দল আজিকার স্তব্ধ মৌন সাঁঝে।
অস্ফুট নক্ষত্রালোকে উপহাসে তোমারে বিমান,—
আপনারে রিক্ত করি লভিলে এ শেষ প্রতিদান!
তোমার অদৃষ্ট হেরি ভাবি মোর ভবিষ্যের নিষ্ফল প্রয়াণ,
বিশ্বে যাহা দানি' যা'ব
সেকি দিবে তা'র প্রতিদান?

কদম ফুল

নয়ন খোল, নয়ন খোল কদম-কলি সুন্দরি!
তোমায় আজি ডাক্‌ছে লো সই বাদল-মেঘের নীলপরী।
শ্রাবণ-ধারা পড়ছে ঝরে সবুজ পাতার কুঞ্জ'পরে,—
মন-চকোরী গুঞ্জরে তার মিহি চিকণ সুর ধরি'।

বাজছে জলদ-সারঙ্গীতে মল্লার রাগ উল্লাসে,
মর্ত্ত্যে হেথা বন-ময়ূরী পেখম ধরি' দূব্‌-ঘাসে
নাচ্‌ছে সুরের মঞ্জু তালে, সেই নাচনের অন্তরালে
ময়ূর শুধু নয়ন মুদি' পড়ছে বাঁধা প্রেম-পাশে।

কদম্ব ফুল! কদম্ব ফুল! নয়ন খোল আজ রাণি!
কাঁটার বুকে গৌরী কেয়া দিচ্ছে তোমায় হাতছানি।
বুকের কুঁড়ি ফুটল যে তা'র ছড়িয়ে পড়ে গন্ধ-বাহার—
সেই সুবাসে যায়গো তাহার কস্তূরী আজ হার মানি'।

বুকের চোখের ওড়্‌নাখানি খোল কদম ফুল্‌-বালা,
দেখ্‌না চেয়ে রামধনুকে লাল গোলাপের রঙ ঢালা।
বাউরী বাতাস ডাক্‌ছে লো আজ ঘোম্‌টাতে সই নেই কোন কাজ,
ঘুম্‌-নিদালির আড়ালখানি দেয় না বুকে দুখ-জ্বালা?

চাতক চকোর যূথীর চোখে ঘনাল আজ নীল মায়া,
মনটি তাদের ভুলাল সই! শাঙন-মেঘের আব্ছায়া।
আজকে তা'রা কর্‌ছে কেলি, উড়ছে স্বপন-পাখ্‌না মেলি'—
কোন বিদেহীর পরশখানি দোলায় তাদের দিল্‌কায়া।

কদম-কুঁড়ি! কদম-কুঁড়ি! দেখ্‌না চেয়ে চোখ চাহি,
তোর ডালে আজ ঝুল্‌ছে ঝুলন কুলের বালা গান গাহি।
ফোটা ফুলের কেশর দিয়ে কপোল তাদের দাও রাঙিয়ে;
বৃন্দাবনের কাজরী গাথা গাও,—সরমে কাজ নাহি।

ঘাটের 'পরে অই কিশোরীর চপল মুখর কিঙ্কিণী,
বল্‌ছে মুখের ওড়্‌না খানি খুল্‌তে শুধু রঙ্গিনি!
তা'র বুকে আজ নেই কাঁচলী ঘোম্‌টা মুখে নেইক কলি!
হে সুন্দরি! লওগো আজি অই কিশোরীর মন জিনি',
নয়ন খোল নয়ন খোল ঘুমের কারা-বন্দিনি!

মিনতি

ওগো ও কিশোরী বালা ওগো ও সোণার মেয়ে!
আজি কি গাঁথিছ মালা ফুল-পানে চেয়ে চেয়ে?
চাঁপার আঙুল দিয়ে রূপালি সূতোর মাঝে
বিঁধিছ ফুলের হিয়া সোণালী বরণ সাঁঝে।
কুসুমে কাঁটা ত' নাই—তবে কেন ব্যথা-হাসি
পাগল অলক সাথে মিশিয়াছে ঠোঁটে আসি'?
অই মুখ অই আঁখি চেয়ে চেয়ে মনে হয়—
এ যেন গোধূলি-তারা, উষার হাসিটি নয়।

বুঝিয়াছি আমি তব বুকের চিতার দাহ,
ফুল-মালা পরি' গলে সে-শিখা নিভাতে চাহ?
বুকে যার এত ব্যথা দেহে কেন এত সাজ?
পরণে কেন বাসাড়ী—চরণে আলতা আজ?
বিনায়ে বেঁধেছ বেণী ওগো ও কিশোরী রাণি!
তারই কারাগারে মোর কাঁদিতেছে হিয়াখানি।
তোমারে হেরিয়া কাঁদে আলো-ভরা নভতল,
গাগরী-ভরণে গেলে জল করে ছল ছল।
ওগো ও অধরা মিতা! নিভাতে তোমার দাহ
এ পথিক আনিয়াছে দুটি আঁখি বারিবাহ।
আজি রচিতেছ মালা কুসুমেরে বিঁধে প্রিয়,
সেই ফুলদল সাথে আমারেও গেঁথে নিও!

পরদেশীয়া

পরদেশীয়া ! পরদেশীয়া ! রঙ্গিলা লো বন-পাখি !
শুবাক সারির কুঞ্জে রহি আজ কারে তুই যাস্ ডাকি ?
কুয়াস-ঢাকা মাঘ-প্রভাতে
তুই এলি কা'র ঘুম ভাঙাতে ?
কন্‌কনে এই শীতের কাঁপন দোলায় না তোর পাখ্‌না কি ?

ডাকিস্ কা'রে দূর দেশিনি ! জংলী সুরের ভঙ্গীতে ?
এখনও তো ঘুম্ কারো হায় ভাঙ্‌ল না তোর ইঙ্গিতে !
বঁধুর বাহু-শিথান'পরে
পরাণ-প্রিয়া তন্দ্রা'ভরে
রয়েছে অই, দেয় না সাড়া সে-যে মধুর সঙ্গীতে।

সুন্দরী লো !'বুলবুলিয়া দিচ্ছে তোমায় টিট্‌কারী,
শুনছি শালিক টিয়ার মুখে চটুল সুরের গিট্‌কারী।
সাঁই সাঁই অই ঝাঁঝাল হাওয়া
তোর সনে গায় গজল-গাওয়া ;
দুর্ব্বাঘাসে মুক্তা ছিটায় শুক্লারাতির পিচ্‌কারী।

নিশীথ-জাগার কোন সাথীরে ডাকিস্ রে তুই নিদ্-হারা।
বল না মোরে করল কেবা এমনি তোরে ঘরছাড়া ?
কার লাগি হায় রে বন-পাখি !
বেহাগ সুরে উঠিস ডাকি ?
বহাল কে তোর নয়নে তপ্ত তরল নীর-ধারা ?

অই যে দূরের পূব-অচলে দিচ্ছে রবি হাতছানি,
লাখ্ তরুণীর ঠোঁটের চুমায় লাল হ'ল তা'র মুখখানি।
আজকে চেয়ে তাহার পানে
বেদন কি তোর বাজছে প্রাণে ?
ঘুম্-নিদালি ভাঙল রে তোর নিষ্ঠুরা সে কোন রাণি ?

তোর সে বিধুর চঞ্চুপুটে সোহাগ চুমার দাগ রাখি'
আধেক রাতে পালাল যে—সে কোন পাষাণ বল পাখী ?
তাই কি আজি এমনি ভোরে
গুবাক তরুর কুঞ্জ'পরে
শিউরে একা উঠলি জেগে পাতার কোণে মুখ ঢাকি ?

দেখনা শিরীষ-শিমূল-কুঁড়ি চাইছে শুধু তোর পানে,
তাদের কেশর-শয্যাতে আজ গুঞ্জে মধুপ মুলতানে।
তোর গীতালির আমেজ আজি'
সারঙ্গে তা'র উঠছে বাজি',—
সেই সে সুরের রেশখানি হায় মর্ম্মে আমার দুখ হানে।

পরদেশীয়া ! পরদেশীয়া ! তোর গানে আজ সুন্দরী !
উঠছে রে এই উদাস কবির শূন্য বিধুর বুকভরি'।
তোমার সুরের সুরা পিয়ে
আসছে দুটি চোখ বুজিয়ে,
ভাসিয়ে মোরে নিচ্ছে যেন অলখ-স্রোতে ঘুম্-পরী !

গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা সুন্দরী গো নিদ-হারা !
তোর বেদনে উঠুক দুলে এ দেউলিয়ার হৃদ-পারা।
তোর মত দুখ বক্ষে বাঁধি'
আমিও হায় অমনি কাঁদি,—
নিলাম বেঁধে তোর সুরে তাই আজকে আমার একতারা।

আলেয়া

শোন শোন ওগো কিশোরী মৌনাননা !
এ কবিরে আজ করিয়াছ তুমি উন্মাদ উন্মনা।
চপল তোমার কাজল অলক এলোমেলো বায়ে উড়ি'
নয়ন ধাঁধিতে মায়া-জাল যেন বুনিছে বিশ্বজুড়ি'।
কালো দুটি চোখ যেন চুম্বক—চোরা চাহনিরে হানি'
ওগো সুদূরিকা ! দূর হতে লয় পথিকের হিয়া টানি'।
সিঁদুরিয়া রাঙা দুটো লাল ঠোঁটে কি বাণী রেখেছ ঢাকি
কি যেন পরশ মাগে সে গোপনে প্রবল কামনা মাখি'।
হোলদে চাঁপার প্রলেপ লেপিল কেবা অই চারুদেহে ?
ফণীর মতন বিণায়ে বেণীটি বাঁধিয়াছ কত স্নেহে !

ওগো বিদ্যুল্লতা !
এ পথিক সনে অবাক নয়নে কহিলে কি আঁজি কথা ?
অই রাঙা মুখে বাণী ফুটিল না ? কঙ্কণ-ঝঙ্কারে
তব হৃদয়ের গোপন বারতা জানাইছ বারে বারে ?
সুধাইলো তোমা হে কিশোরী মেয়ে হে শোভনা সুন্দরী !
কি মধু রেখেছ বঞ্চিত অই বুকের গাগরী ভরি ?

শোন শোন হে বিধুরা,
তোমার চরণ-রক্তিম আভা রক্ত কৃষ্ণচূড়া
চুরি করিল কি পথের ধূলারে লাল করিবার তরে ?
তারই গৈরিকে সিঁদুর তুমি কি পরিবে সিঁথীর 'পরে ?
মউমাছি আজি বাঁধিয়াছে বাসা ঘেরি তব তনুখানি,
তারই মাঝে কিগো ডাকিলে আমারে আজি কে মক্ষি-রাণী ?
আজ কোন কাজ নাহি ওগো মোর—কোন কথা কহিব না,
দূর হ'তে শুধু হেরিব ও-তনু হে অনতি যৌবনা !

সুন্দরী নিরূপমা !
তিল তিল করে নিলে প্রাণহরি' তুমি কি তিলোত্তমা ?
কমণীয় অই ললাটে ভাতিছে কামনার ললাটিকা,
সারাটি অঙ্গে জ্বলিছে তোমার যৌবন-দীপশিখা।
তা'রি আলোকে তো আঁধি ঘুচিল না, জ্বলিল না মোর বাতি,
আজি হায় শুধু সৃজিলে এ বুকে কাজল কৃষ্ণা রাতি !

হারিয়ে-যাওয়া পাখী

সেদিন বরষা-রাতি গগনে তারার পাঁতি
মিশে গেছে আঁধারের কূলে,
গুরু গুরু গরজনে বাদলের বরিষণে
ধরাখানি গিয়েছিনু ভুলে।

বিজলীর হাসি খানি মরণের তমোবাণী
এনেদিল মোর কালো বুকে,
বাহিরে আকাশ-পানে নাম-হারা কা'র টানে
চেয়ে আছি ব্যথা-ভরা সুখে।

পবনের স্বন্ স্বন্ বরষার বরিষণ
দাদুরীর উতরোল্ গীতি,
পশিল মরম-কোণে তারি সনে ক্ষণে ক্ষণে
ভেসে এলো অতীতের স্মৃতি।

অস্ফুট স্বপন-ঘোরে আমি-হারা যেন মোরে
হারায়ে ফেলেছি সেইদিন,
আকাশে মৃদঙ্গ-রোলে কেতকীর ঘনদোলে
উঠেছিল বেজে হৃদি-বীণ্।

বিশ্ব যেন শুধু আলো বাহিরে আঁধার কালো
রাতিয়ায় বাদলের:ক্ষণে,
আমার আঁখির দিঠি আঁধারে আলোর চিঠি
পড়েছিল যেন একমনে।

আমি যেন আছি একা আঁধিয়ায় ছিল লেখা—
কিছু নাই কিছু নাই আর,
আছে শুধু এক বাণী আজো তা'রে নাহি জানি
বাণী যেন জ্যোতি-পারাবার।

আধো স্বপ্ন-জাগা প্রাণে চেয়ে আছি দূর পানে
বসে আছি বাতায়ণ-দ্বারে,
নীড়-হারা এক পাখী কারে যেন ডাকি ডাকি
মিশে গেল তিমিরের পারে।

তা'র আর্দ্র পাখাখানি স্বপ্নে গড়া একবাণী
রেখে গেল মরমের কূলে,
বুঝি পাখী নীড়-হারা হৃদয় পাগল-পারা
পথখানি গিয়াছে সে ভুলে।

রহিলাম আমি জাগি সারারাতি তারি লাগি
তবু ত'র নাহি পেনু দেখা,
মিশে গেল আঁধিয়ায় গেল শুধু রাখি হায়
মোর বুকে ম্লান এক রেখা।

হারিয়ে-যাওয়া পাখী

তিমির নিশার পাখী আজো যেন থাকি' থাকি'
ডেকে যায় মোরে নিশি-মাঝে,
জ্যোতি-হীন তা'র কায়া দিয়ে গেছে কালো ছায়া
সুর তা'র রহি' রহি' বাজে।

আমার জীবন খানি আজো হায় নাহি জানি
পথভোলা পাখীর মতন
মিশিবে কি অন্ধকারে? মরণের পরপারে?
বিশ্ব কভু করিবে স্মরণ?

নীড়-হারা পাখী মোর ঝরাইল আঁখি-লোর্—
হেরি আজি জীবনের ধারা,
পাখী-সুর বুকে বাজে কোন দূর মরু মাঝে
মিশে যা'ব হ'য়ে নাম-হারা?

পথের মেয়ে

পথের মেয়ে ! পথের মেয়ে ! একটু দাঁড়াও অই পথে,
উন্মনা এক গাঁয়ের কবি ডাকছে তোমায় দূর হ'তে।
একটু শুধু আস্তে চল ; এখনও তো সাঁঝ-রবি
যায়নি ডুবে মর্ম্মে আঁকি লাল গোধূলির শেষ ছবি !
কৃষ্ণচূড়ার আব্‌ছায়াতে ক্ষণেক দাঁড়াও আজ রাণি !
সন্ধ্যা-তারা এখনও যে দেয়নি তোমা' হাতছানি।
কোন্ গাঁয়ে আজ যাচ্ছ তুমি হিজলতলার কোন্ হাটে ?
যাত্রা-শেষে থামবে কোথা' অচিন সুদূর কোন্ বাটে ?
এই পথিকের কথা শুনে হাস্‌ছ কেন কও মেয়ে ?
বুকখানি মোর উঠছে দুলি' না জানি কোন সুখ পেয়ে !

অই হাসিতে ফুট্‌ছে তোমার হাস্‌নুহানার শ্বেতকলি,
চোখের কাজল হেরে' ওঠে চিত্ত-চকোর চঞ্চলি'।
ধূপছায়া-রঙ সাড়ী তোমার ধূপের সুবাস আনছে গো !
কালো চুলের জমাট আঁধার বক্ষে বেদন হানছে গো !
পদ্ম ফোটার শব্দ আমি শুনছি তোমার বক্ষেতে,
শতেক লাখ মৌমাছি আজ উড়ছে দুটি চক্ষেতে।
রঙিন্ পায়ে পড়ছে তোমার কৃষ্ণচূড়ার দল ঝরি',
আমার বুকে ফুটছে স্বপন—গৌরী কেয়ার মঞ্জরী।

পথের মেয়ে ! পথের মেয়ে ! একটু দাঁড়াও অইখানে,
দুইটি কথা কইতে তোমা' সাধ জাগে আজ মোর প্রাণে।
সন্ধ্যাপ্রদীপ যেই কথা কয় সন্ধ্যামণির মুখ চেয়ে ;
যেই ভাষাতে ভ্রমর ওঠে জুঁই ফুলেতে গান গেয়ে ;
বসন্ত কয় নিঃস্ব তরুর শাখায় শাখায় যেই বাণী—
সেই সে কথা কইতে তোমা' মন কাঁদিছে আজ রাণি !
ভয় রেখোনা বুকের কোণে হে সুন্দরী চঞ্চলা !
রূপ-পিয়াসী কবির লাগি' একটু থামাও পথ-চলা।
অতিথ্ সেজে এলাম আমি তোমার রূপের অঙ্গনে,
দুইটি তিথি রেখো শুধুই আমায় মনের এককোণে।
তার পরে যাও যেও ভুলে দুঃখ কিছু নেই তা'তে,
শিশির-কণা কদিন জ্বলে স্নিগ্ধ-শ্যামল দুর্ব্বাতে ?
অচিন দেশের মেয়ে ! তোমায় ডাকছে রূপের সন্ধানী,
যাবার আগে দাওতো জ্বেলে আমার ঘরের দীপখানি।
সোণা হাতের পরশটুকু যাওগো রেখে সুন্দরী !
সেই দানেতে উঠবে জানি রিক্ত কবির বুক ভরি'।

ধ্রুবতারা

তৃতীয়া তিথির ক্ষীণ শশী-লেখা পশ্চিম নভ-তলে
'নিবু' 'নিবু' ক'রে উঁকি দিতেছিল যামিনীরে পলেপলে।
ফাগুন সেদিন বহিল প্রথম ;—দখিণা বাতাস রাশি
হেরিল আমারে বাতায়ন-পথে চাঁদিমার সাথে হাসি'।
স্বপন-দেশের প্রণয়-বুলানো মৃদুল কোমল বাণী
ক'য়ে গেল মোরে ফাল্গুন-সখা ধীরে করি কানাকানি।
ত্রিযামা-নিশার বিদায়ের শেষে বকুলের শাখে বসি'
গাহিল কোকিল প্রাণ-কাড়া সুরে,—তারি তান কাণে পশি'
উঠিল শিহরি' তরুণ তনুটি, কাঁপিল পরাণখানি,
প্রথম প্রেমের দূত সনে হ'ল সেইদিন জানাজানি।

জ্যোৎস্না মিলালো আকাশের গায়ে, তারকা লুকালো লাজে,
ধ্রুবতারাটির আলোক তখনো রয়েছিল মোর মাঝে।
কত রজনীতে হেরেছিনু তা'রে কহিনি একটি কথা,
অধর কাঁপিল সেদিন প্রথম জানাবারে ব্যাকুলতা।
হারানো দিনের যতেক স্বপন ব্যর্থ স্মৃতির রূপে
দাঁড়াল আসিয়া মরমের কোণে অতি ধীরে চুপে চুপে।
যে বেদনা মোর কেঁপেছিল প্রাণে উঠেছিল শিহরণ,—
গেয়েছিল সেই বেদনার গীতি ধ্রুবতারা অনুখণ।

দু'জনে নিরখি' রয়েছিনু হায় সেদিন দোঁহার পানে,
দু'জনার ছবি উঠেছিল ফুটি' দু'জনার মন-প্রাণে।
বেদনার ঘোরে আঁখি দুটি মেলি' হেরিনু নীলিমা-ভালে,
ধ্রুবতারা মোরে নিরখি হাসিল আকাশ-অন্তরালে।
চিরজনমের পরিচয় হ'ল সে নিশায় তারই সনে,
সেই স্মৃতি জাগে মানস-দুয়ারে আজিকার নিশি-খণে।
পাষাণী উষার নিশাসের রাগে আমার মূরতিখানি
বুকে এঁকে তা'র নিমিষে লুকাল না-দেখার রেখা টানি'।
প্রণয়-মাখান যে-স্বপনখানি হেরেছিনু সেই রাতে,
ক্ষয়হীন তা'র স্মৃতিটুকু আজো ফিরে মোর সাথে সাথে।

গ্যাসের আলো

দিবাশেষে যবে পশ্চিম নভে সূর্য্য পড়ে গো ঢলি,
আঁধার যখন ধরণীর বুকে ধীরে ধীরে পড়ে গলি',-
ভজুয়া তখন মইখানি আর
দীপ-শলা ল'য়ে হাতে
ছুটোছুটি করে' গ্যাসের আলোক
জ্বেলে দেয় রাস্তাতে।

এতে ভুল কভু হয় না ক তা'র—
প্রতি সন্ধ্যার কাজল আঁধার
তারই কাছে শুধু মাগে বারবার
কি যেন রে অনুখণ
পরের গলিতে প্রদীপ জ্বালানো
বড় তার প্রয়োজন।

সন্ধ্যার ক্ষণে আলো উঠে জ্বলে'
বস্তিতে বস্তিতে,
প্রতিবেশী সবে কাটায় রজনী
ঘরে ঘরে স্বস্তিতে

ঝিলিমিলি করে গ্যাসালোকে রাতি,
শুধু তা'র ঘরে নিবু নিবু বাতি—
তারই জ্বালা পথ-দীপ-পানে চেয়ে
করে তা'রে বিদ্রূপ,
আধো-জাগ্রত স্বপনে সে হেরে
মহা জীবনের রূপ।

আমি শুধু মনে-মনে
ভাবি বিস্ময় সনে—
তা'র মত আরো কত লাখ জন
আছে ধরণীর 'পরে,
আমরণ যা'রা পরের খাতার
হিসেব নিকেশ করে।
তা'রা—মিটাইছে শুধু অপরের ক্ষুধা
নিঃশেষে দানি' নিজ প্রাণ-সুধা ;
বসন্ত সম বন্ধ্যা বাগানে
ফুটাইয়া রাঙা ফুল,
যাত্রার শেষে পেয়েছে দেখে সে
কিছু কাঁটা, কিছু ভুল

গাড়োয়ান

বোশেখ মাসের তপ্ত দুপুর খাঁ খাঁ করে দিনমান,
রাঙা সূর্য্যের তাতল তাপেতে হাহাকারি উঠে প্রাণ।
কঠিন নীরব রাস্তার শিলা
ঘেমে উঠে হেরি' রৌদ্রের লীলা,
দিগন্ত জুড়ি' ছুঁড়িছে কে যেন ধারালো অগ্নি-বাণ।
বোশেখের চির খর রোদ্দুরে বিশ্ব মুহ্যমান।

হাঁকায়ে চলিছে ভাড়াটিয়া গাড়ী এ হেন দ্বিপ্রহরে
গাড়োয়ান এক—অঙ্গেতে তা'র আগুনের কণা ঝরে।
ঘোড়ার পৃষ্ঠে হানে সে চাবুক,
ফুলে ওঠে তা'য় পঞ্জর বুক—
তবুও ছুটিছে জোর সে কদম—লাগামটি মুখে ধরে।
ঘন ঘন বাঁশি বেজে উঠে তা'র নাসার রন্ধ্র-স্বরে।

পথের শিলাতে গাড়ীর চাকাতে মিতালি না জানি কত,
চক্রনেমির চুম্বনে তা'র পরাণ ওষ্ঠাগত।
অশ্বের মুখে ঝরিতেছে ফেনা—
শোধিছে কি তায় জীবনের দেনা ?
ভাড়াটে গাড়ীরে টেনে বুক তা'র ক্ষয়রোগে হল ক্ষত ;
গাড়োয়ান শুধু দিন মজুরীর হিসেব নিকেশে রত।

বহুদূর গেছে আঁকিয়া বাঁকিয়া পুরাতন পথখানি,
কোন বাঁকে গিয়ে যাত্রা তাহার শেষ হবে না'হি জানি
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরে চলে চাকা,
জীবন তাহার আজি বড় ফাঁকা—
গাড়োয়ান হেরে বাঁচার স্বপন ঘোড়ারে চাবুক হানি',
অশ্ব ছুটিছে—মজুরি তাহার কিছু দানা আর পানি।

কামারশালা

বহুকাল পরে গাঁয়ে এসে মোর দেখিনু সেদিন সাঁঝে
চিরচেনা সেই দিনুরে তাহার কামারশালার মাঝে।
অতি পুরাতন কর্ম্মকার সে,—বসে বসে দিনরাত
ঠুঙা ঠুং ঠুং হাতুড়িটি হানে করে শুধু প্রাণপাত।

তা'র একখানি ছোট্ট দোকান, ভাঙা বেড়া দিয়ে ঘেরা,
'দাও' বানাইতে দিনু এ গাঁয়ের সবার চাইতে সেরা।
মাঘেতে পৌষে পড়োভূঁয়ে যা'রা করে খেজুরের চাষ,
ধারালো কাটারি মাগে তা'রা আসি সে দোকানে বারমাস

বাজারের দিনে বড় কাজ তা'র—ঝালাপালা ক'রে কাণ
কেউ বলে 'দাও কোদাল সারায়ে' কেউ বলে 'দাও শান্'।
কহে কেউ 'ভায়া! ভোতা হয়ে গেছে মোর কাস্তের দাঁত',
দিনু কয় 'তবে বদল কর না মোর দন্তের সাথ'।

চাষী ও রাখাল জটলা পাকায় বসে চুল্লীর পাশে,
কথাটি না ক'য়ে মাথা নেড়ে দিনু মাঝে মাঝে মৃদু হাসে।
বহ্নির তাপে ঝলসিয়া গেছে তাহার দুইটি চোখ,
কয়লার গুঁড়ো প্রিয় তা'র কাছে—যতই সে কালো হোক।

অঙ্গার-মুখে অগ্নি জ্বালিয়া টানে সে হাপর খানি,
সেই আগুনের বুকে চেপে দেয় কঠিন লোহারে আনি'।
হাতুড়ির ঘায় থ্যাঁতলিয়ে যায় হায়রে তাহার বুক,
যত ব্যথা পায় তত রাঙা হয়ে উঠে তা'র কালমুখ।

কামার ভায়া সে লৌহ পিটিছে একমনে নিশিদিন,
কানা করিবারে চাহে আঁখি তা'র ফুল্‌কির আলপিন।
হাপর শুধুই ফুঁপিয়ে কাঁদিছে—ফাঁকা বুকে বাজে বাঁশি,
রাঙা বহ্নিতে ফাটিয়া পড়িছে বারবনিতার হাসি।

সে-হাসিটুকুন কিছু নয়—শুধু দুখের জমাটরূপ,
বিশ্ব-কামারশালায় করে সে জীবনেরে বিদ্রূপ।
অনলের চির তাতল তাপেতে লোহা করে হায় হায়!
অঙ্গার শুধু সংজ্ঞা হারায় প্রাণান্ত বেদনায়।

মানুষের মতো তা'রাও বন্ধু! হাসিতে কাঁদিতে জানে,
শিকল টানিলে বাতাস ফোঁপায় হাপরের মরা প্রাণে।
বুঝেও বুঝিতে পারে না দিনু যে তাহাদের ক্রন্দন,
কেন দুষি তা'রে? মজুরির আজ বড় তা'র প্রয়োজন।
তোরা—বলিসনে কিছু চুপ,
কামারশালায় দেখে যারে শুধু মহাজীবনের রূপ।

চৈতালি

মলয়-আয়ু ফুরিয়ে গেলো,—
বনের বুকে ফুলের গা'য়
বিদায়-বেলার ব্যাকুল শ্বাসে
চৈত্রী-হাওয়া মিলিয়ে যায়।

গ্রামের শেষে মাঠের বুকে
ফসল-কাটা কৃষাণ-গান
ধ্বনিছে মোর হিয়ার মাঝে,
গুম্‌রি উঠে আকুল প্রাণ।

রিক্ত-ফসল মাঠের 'পরে
আকাশ-বধূর আঁচল-ব্যেপে
গোপন কথার গোপন সুরে
ক্ষণকে মন উঠ্‌ছে কেঁপে।

তপ্ত বায়ুর উগ্র নিশাস
ঝিমিয়ে-পড়া পাতার বুকে
ফেল্‌ছে আছি ক্ষণে ক্ষণে
প্রণয়-ভরা গোপন সুখে।

বিকোয় কৃষাণ ক্ষেতের ফসল
চোতের শেষে গ্রামের হাটে,
প্রাণ-উদাসী কপোত ডাকে
অশথ-শাখে বিজন মাঠে।

ওরে, আয় তোরা সব আয়!
চোতের হাওয়া ফুরিয়ে এলো,—
বুকের ফসল ব্যাকুল বায়
সুরের দোলায় দুল্‌ছে আজি,
বিদায়-বেলার বইছে শ্বাস,
ফসল-কাটা মাঠের শেষে
ডাক্‌ছে আমায় নীল আকাশ।

এই জীবনের বিপুল বোঝা
লুটিয়ে নে'রে লুটিয়ে নে,
গানের ভারের বাঁধন তোরা
মনের মানুষ টুটিয়ে দে।

শষ্য-হারা মাঠের বুকে
চোতের হাওয়া নিঃস্ব আজ,
বিলিয়ে দেওয়ার সে-সুর-কাঁপন
ঝঙ্কারে মোর মনের মাঝ্।

আয়রে তোরা—বিলিয়ে দেব
আমার হিয়ার ফসল যত,
আঁচল ভ'রে লুটিয়ে নে'রে
নিঃস্ব ক'রে মনের মত।

বসন্ত-শেষ গোপন শ্বাসে
নুইয়ে পড়ে যতেক ফল,
আয়রে তোরা, আয়রে আজি
আয়রে মনের মানুষ-দল।

আজ, আয় তোরা সব আয়!
উদার মলয় রিক্ত মাঠে
তপ্ত হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

শ্রমিক-প্রশস্তি

কহে শ্রমিকের কবি—
দু'টি আঁখি খুলে চাহ একবার পীড়িত নরের ছবি।
রূপের বাজারে বেসাতি করিতে এবার যাবনা ভাই,
বিশ্বদেবের কর্ম্মশালায় চল একবার যাই।

চকোর চাতক চাঁদের বেদনা অনেক হল ত শোনা,
বিরহের রাতে ঝরিয়াছে কত নয়নের জল লোনা।
বুল্‌বুলি-গান শুনিলাম কত ফুল-বাগিচায় বসি',
কত তরুণীর হাসিতে পরাণ উঠিয়াছে উচ্ছ্বসি'।
রূপের ধনুর নির্ম্মম শরে কত আঁখি হল কানা,
মোহ-মাখা হৃদি উড়িতে চাহিছে মেলি' আজ দু'টি ডানা।

বন্ধ কর সে-পাখা,
এমন করিয়া দুনিয়ায় আর হবে না কাহারও থাকা।
রূপখোর আঁখি উপাড়ি ফেলিয়া ফতুর হইয়া সবে
কল্পনা ছাড়ি' চলিতে হইবে সোজাপথে বাস্তবে।
মানুষের গান গাহিল না কেহ চাহিল না তা'র পানে,
মানুষ ছাড়িয়া চলিয়াছ সবে তা'র রূপ-সন্ধানে।

রঙিন স্বপনে প্রয়োজন আজ নাই,
আপন ঘরেতে আগুন লেগেছে ফাগুনে কি কাজ ভাই ?
দখিণার বায়ে বধির করেছে মোদের কর্ণ দু'টি,
মানুষের যত হৃদয়-মমতা নিয়াছে সে সব লুটি'।
মলয়-কাঙাল অন্তর নিয়ে তাইতো আমরা হায় !
সাড়া দিতে নারি দুনিয়ার যত ইতরের বেদনায়।
রূপের চরণে উজার করিয়া ঢালি মোরা আঁখি-জল,
তাইতো বন্ধু পীড়িতের লাগি' জেগে উঠে শুধু ছল।

তাই বলি—চল ভাই
একবার সবে বিশ্ব-শ্রমিক-কর্ম্মশালায় যাই।
চল যাই সেথা হায়রে যেথায় মোদেরই মতন নর
ঘর্ম্ম ফেলিয়া কর্ম্মশালায় মরিছে নিরন্তর !
মর্ম্মে তা'দের কী বেদনা হায় !—মোরা যদি কভু পারি—
তাদেরই লাগিয়া সঞ্চিত ক'রে রাখিব আঁখির বারি।

হাতুড়ি-শাবল-কোদাল-কুড়োল-লাঙল আপন মনে
চালাইছে যা'রা রৌদ্রে হাঁপায়ে চির বেদনার সনে—
দুর্গম গিরি কর্দ্দম ক্ষেতে অন্ধ খনির তলে
ওরে দুই মুঠো অন্নের লাগি দিবারাতি পলে পলে
জীবন মৃত্যু তুচ্ছ করিয়া খাটিতেছে যা'রা হায় !
চল একবার সাড়া দিয়ে আসি তাহাদের বেদনায়।

রূপ আর সেই ক্ষুদ্র প্রেমের বন্দনা-গীত ছাড়ি'
মুক্ত কণ্ঠে গাও সবে গান শ্রমিকের বেদনারি।
মোদের মতন তা'রাও বন্ধু! হাসিতে কাঁদিতে জানে,
দুঃখ সুখের ছায়াটুকু লাগে তাদেরও মর্ম্মে প্রাণে।

তা'রা-যে মানুষ একথা সুনিশ্চয়,
মনুষ্যত্ব তাহাদেরও আছে এ কভু মিথ্যা নয়।
তবে কেন মোরা দিবারাতি ওরে দু'পায়ে তা'দের দলি?
তবে কেন যা'রা বিশ্বের প্রাণ ইতর তাদের বলি?
তবে কেন যত উদ্ধত আর দৃপ্ত ধনীর দল
পিষিয়া মারিতে চাহিছে তাদের দিবারাতি পলে পল?
মানুষ হইয়া মানুষেরে কেন বঞ্চিত করি হায়!
বাধার শিকল পরাইয়া মোরা দিয়াছি তা'দের পা'য়।

হাত ধরে আজ তা'দের তুলিতে হ'বে,
ঘৃণা করে শুধু যা'দের দলিয়া মোরা চলিয়াছি সবে।
ভাই বলে' আজ করিতে হইবে তা'দেরে আলিঙ্গন,
মুক্তি-মায়ের তনয় তাহারা একথা অনুক্ষণ
মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে হইবে—তবে স্বাধীনতা-সতী
মোদের দুয়ারে আপনি আসিয়া জানাইবে তা'র নতি।

এ-কথা মিথ্যা নয়,
গাও তবে ভাই একবার সবে 'জয় শ্রমিকের জয়'।

ঝড়ের সমুদ্র

মহাবারিধিরে মন্থন করি' ভীমগরজনে উর্ম্মিদল
ছুলিয়া ফুলিয়া ছুটে আসে অই কাঁপাইয়া মহাপৃথ্বী-তল।
মহাউল্লাসে প্রলয়োচ্ছ্বাসে গরল উগারি' যেন রে ফণী
তাথিয়া তাথিয়া নৃত্য করিয়া আসিতেছে—তা'র বিপুল ধ্বনি
হুঙ্কারে ওরে 'ওম্ ওম্ ওম্',
ত্রাসে কাঁপে তা'র মহীতল ব্যোম্—
তারই স্থর শুনি' ছায়াপথে অই থেমে গেছে গ্রহ-উল্কা-শনি।
লক্ষ পাঞ্চজন্য আজিকে সঘনমন্দ্রে উঠিছে রণি'।

আসে কল্লোল মহাকল্লোল মহামানবের বার্ত্তাবহি',
তাহারই মন্ত্র গাহে যেন আজ ফেন উচ্ছল লক্ষ অহি।
প্রলয়-নাচন নাচে তা'রা আজ
অঙ্গে জড়ায়ে ধ্বংসের সাজ—
মহাকাল বুঝি উঠিয়াছে জেগে পীড়িত নরের বেদনা সহি'।
কলকল্লোল ছুটে আসে অই রুদ্র গরবে ধ্বনিয়া মহী।

আসে নটরাজ হাসে নটরাজ নাচে নটরাজ উর্ম্মি-সাথ,
জটার বাঁধন খুলে' গেছে তা'র—ঘনায়ে আসিছে তিমির রাত
তাই বুঝি অই অর্ণব-তীরে ?
হাহা হাহা হাসি তাই ওরে ফিরে
দিগম্বরের বিষের বাঁশিতে ফুকারি' তুলিছে বজ্রনাদ ?
জটা খুলে' দিল নটরাজ—তাই গেল ফিরে খুলে' প্রলয়-বাঁধ ?

সিন্ধুর মহা উর্ম্মি তুলিছে তালে তালে ওরে রুদ্রতান,
তারই মাঝে আমি শুনিতেছি শুধু সাম্যসামের ছন্দগান।
পীড়িত ইতর শূদ্র চামার
মেথর মজুর কৃষাণ কামার
কল্লোল-সাথে মিশাইয়া ওরে মহান তা'দের ব্যথিত প্রাণ
ভৈরব সুরে গাহিতেছে সবে সাম্য সামের বিপুল গান।

উদ্ধত যত দৃপ্ত ধনীর বিদ্রোহী তা'রা, এ কথা আজ
জানাতে চাহিছে সৃজি' বিপ্লব ধনী-ভোগ্যা এ-বিশ্বমাঝ।
ধন-কুবেরের সঞ্চিত ধন
এক সাথে তা'রা করি' লুণ্ঠন
মিটাইবে সবে ক্ষুধার যাতনা—লুণ্ঠনে তাই নাহিক লাজ ;
তা'রা সবে ওরে অন্নের লাগি' পরিয়াছে আজ দস্যু-সাজ।

ধরণীর স্তন ছিন্ন করিয়া হাঁকিতেছে সবে "অন্ন চাই,
শ্রমিক আমরা ভবনে মোদের আজি একমুঠো অন্ন নাই।
সারাদিন মোরা খেটে খেটে হায়
ঘর্ম্ম ফেলিয়া যা' করি উপায়,
তারই সব নেবে ধনীরা লুটিয়া—ব্যর্থতা শুধু আমরা পাই,
ভবনে মোদের নাহি কিছু আজ, দেরে দে অন্ন—অন্ন চাই"।

"ক্ষুব্ধ সিন্ধু-বক্ষ চিড়িয়া আমরা আহরি মুক্তাফল,
জোয়ান হাতের শাবল হানিয়া সমতল করি শৃঙ্গদল।
কণ্টক পথে চরণ ফেলিয়া
মোরা চলি যত বিঘ্ন দলিয়া—
দংশন-ক্ষত হ'ল সে-আঘাতে ক্লান্ত মোদের চরণ-তল।
ক্ষুদ্র শূদ্র বলিছে মোদের তবু হায় ধন-কুবের দল।"

"এত অন্যায় এত নিপীড়ন সহিবনা আর সহিব না রে,
আজ হতে শির লুটাবনা আর ভোগ-আসক্ত ধনীর দ্বারে।
আজি হ'তে মোরা ধন-বিদ্রোহী,
বল না কেমনে এ বেদনা সহি?
ব্যথার মরুভূ ভুখার শ্মশান পাগল মোদের করিল আরে।
ধূ ধূ প্রান্তর ছিল এ ধরণী শ্রমিক করেছে সজীব তা'রে।"

*　　　　　*　　　　　*

মহা কল্লোলে শুনিলাম কত পীড়িত নরের ব্যথিত গান,
তপ্ত শলাকা হানিয়া কে যেন ফুঁড়িছে তা'দের কলিজাখান।
কত বেদনার আঘাতে আঘাতে
উঠিয়াছে তা'রা জেগে আজ প্রাতে,
বিপ্লব-ঝড়ে আনিবে তাহারা ধরণীর 'পরে মহাতুফান,
প্রলয়ের প্রাতে আজিকে তা'দের জাগিয়া উঠেছে সুপ্ত প্রাণ

হে চারণ-কবি! ওরে আজ তুই কল্লোল-সাথে কণ্ঠ খুলি'
গা'রে একবার সাম্যের সাম বিজয়-নিশান হস্তে তুলি'।
শ্রমিকের ব্যথা কণ্ঠে তুহার
উঠুক সঘনে ধ্বনি' বারবার—
স্বপ্ন ছাড়িয়া দেখ ওরে তুই ব্যথিত মহান মানুষগুলি,
কল্পনা ছাড়ি' গা'রে কবি তুই মানুষের গান কণ্ঠ খুলি'।

জাগো নারী

দীপান্তরের বাঁশী বাজিয়াছে বন্দিনী মাতা জাগো,
বুক-ফাটা সুরে ঘুম কি রে তোর আজিও ভাঙিল না গো ?
জাগো জাগো ওমা জাগো।
বৈশাখী-হাওয়া ঈশান কোণেতে বিষাণ বাজায় অই,
হেন দুর্য্যোগে তোর হাতে ওমা বিজয়-নিশান কই ?
ক'দিন রহিবি রূপকথার সে রাজার দুলালী সাজি' ?
সোণার কাঠি যে ছোঁয়ায়ে দিয়েছে তোর শিরে ওরে আজি
ঘুম-ভাঙানিয়া ভীম মহাকাল দিয়ে ঘন করতালি,
জেগে ওঠ ওরে কল্যাণী নারী শক্তিরূপিণী কালী।
ওরে ও বাসুকী লাখ নাগ-মাতা ওরে ও সর্ব্বনাশী !
কালকূট তুই দেরে দে ছড়ায়ে অট্টহাস্যে হাসি'।
লক্ষ গোখ্‌রা লিক্ লিক্ ক'রে তোর কম কাল কেশে
উঠুক ফুঁসিয়া শ্বসিয়া শ্বসিয়া ধূর্জ্জটি হাসি হেসে।
পতিত জাতির রক্তে রাঙান মণি মুকুতার ভার
করিয়াছ তুমি মৃণাল দেহের ভূষণ চমৎকার !
কিবা তা'য় প্রয়োজন ?
লক্ষ প্রাণের মূল্য হ'তে কি অমূল্য সে-রতন ?
রূপ-মরীচিকা জ্বালায়ে হে নারী কিবা হবে আর ফল ?
তোদেরি লাগিয়া লাল হ'ল জানি যুগে যুগে ধরাতল।

হেম হর্ম্ম্যের রম্য পুরীতে হয়ে রাজ-নন্দিনী
রহিবি কি ওরে বিলাসিনী তুই চিরকাল বন্দিনী ?
মনে করিয়াছ মহারাণী তুমি,—তাই মুখে মৃদু হাসি ?
মিথ্যা সে কথা, হয়ে আছো শুধু পুরুষের সেবাদাসী।
হীন সমাজের কারাগার ভাঙি' বাহিরিয়া এসো পথে,
বিশ্ব-নরের সাথে উঠে পড় জগন্নাথের রথে।

পুরুষ তোমারে দিবে না মুক্তি এ কথা সুনিশ্চয়,
নিজ হাতে তব করিতে হইবে সব বন্ধন ক্ষয়।
জাগো জাগো নারী ষোড়শী কিশোরী ধরার দুলালী মেয়ে !
স্বাধীনতা-সতী রয়েছে তোমার সোণা মুখ-পানে চেয়ে।
শান্তি যে তুমি শক্তি যে তুমি—তুমি নারী ছায়া-তরু,
তোমারই পরশে শ্যামল হয়েছে ধরণীর মহামরু।
হে সুষমা সুন্দরী !
চারিদিকে আজ জ্বলেছে পীড়ন-বহ্নি ভয়ঙ্করী।
মুক্তির লাগি' মরণে বরিল কত না সত্যবান,
ওগো সাবিত্রী ! দিতে হবে তোর তাহাদের বুকে প্রাণ।
লখীন্দরেরে করিয়াছে আজি কাল ফণী দংশন,
হে বেহুলা ! আজি আত্মা তাহার মাগে তোর পরশন।
শিব-হারা-যাগ করিতেছে আজি দক্ষ সে প্রজাপতি,
তারই প্রতিশোধ নিতে হবে তোর অয়ি চিন্ময়ী সতী।

শোন ওরে কল্যাণী!
ভুলিস্‌নে তুই দুর্য্যোধনের সেই উদ্ধত বাণী।
আজো এলো কেশে বাঁধিস্‌ কবরী অগুরু-গন্ধ সনে?
ছেলে মরে তোর মরণ-দোলায়—পতি সত্যের রণে!
ফাগুনে এখন কি কাজ হে নারী!—আগুন লেগেছে ঘরে,
সব-হারাদের দখিণ দুয়ার দেরে দে বন্ধ করে।
ঝড়ের হাওয়ায় উড়াইয়া দাও মুখের ওড়্‌নাখানি,
মৃত্যুর সাথে হোক আজি তব অক্ষয় জানাজানি।
নব প্রলয়ের রাঙা মেঘ হ'তে লয়ে বহ্নির শিখা
সীমন্তে প'র সিঁদুর বিন্দু ওগো নারী স্বস্তিকা।
কম করে তব মুছাইয়া দিও পুরুষের ক্ষতদাহ,
নারীর নয়ন জানি যুগে যুগে শান্তি সলিল-বাহ।
ওগো কল্যাণী বিজয়-লক্ষ্মী ওগো ও সীমন্তিনী!
কালকূটে তুমি বানাইতে পার পীযূষ সঞ্জীবনী।
যুগের শঙ্খ তাই
ফুকারে বারতা এ কবির সনে "জেগে ওঠ, ভয় নাই!"

চরকা ও তকলী

চরকা ও তকলী দিবারাতি অনুখণ
বাংলার ঘরে ঘরে ঘুরে আজ বন্ বন্।
চরকার চাকা ঘুরে তারই প্রতি সুরে সুরে
মুক্তি-দেবতা যেন নাচে ওরে বুক জুড়ে।
তকলীর ঘূর্ণনে বুঝি সে সুদর্শন।
শোন তোরা অনুখণ স্বন্ স্বন্ বন্ বন্।

চরকা সে ঘুরিতেছে ঘর্ঘর ঘর্ঘর,
তকলীর সাথে সাথে ফুকারিয়া মন্তর
আজ অন্তরে অন্তরে কি পুলক সন্তরে।
এ যেন সে মরা হাড়ে পরাণের স্পন্দন।
মঞ্জুল রেশে তা'র মুখরিত অঙ্গন;
চরকা ও তকলী ঘুরে অই অনুখণ।

তকলী ও চরকা ঘুরে আজ প্রতি পল,
তা'র ঘূর্ণনে যেন টুটে পা'র শৃঙ্খল।
তারই সে-চাকার জোর ভেঙে দেয় ঘুম-ঘোর;
উড়ে তা'র ঘূর্ণনে বিদেশীর ছলবল।
কি যেন সে উগারিছে রক্ষিতে এ জীবন—
ঘোরে চাকা দিনরাত ঘর্ঘর বন্ বন্।

চরকা ও তকলী

চরকার সূতো যেন অলক্ষ্য বিধি-হাত,
হিন্দু ও মুস্‌লিমে বাঁধিতেছে একসাথ
ঘূর্ণন-রবে হেথা এক জাতি জাগে আজ,
ভিন্‌-জাতি শির’পরে যেন পড়িতেছে বাজ।
তাদের শবদ আরে সিন্ধুর পরপারে
পৌঁছিছে দিবারাতি বিনাতারে বারেবারে ;
আজ মোদের হাসির স্বরে করে কারা ক্রন্দন ?
শোন ওরে ঘরে ঘরে তকলীর বন্‌ বন্‌।

চরকার ঘূর্ণন হুঙ্কারে আজি ‘ওম্‌’,
রেশে তা’র ঝঙ্কারে নভতল মহী ব্যোম্‌,
পূবের অচল-পথে আজিকে সোণালী রথে
উদিছে অরুণ—পরি’ ভালে লাল চন্দন।
চরকা তক্‌লী ঘুরে অনুখণ স্বন্‌ স্বন্‌।

চরকা সুদর্শন ওর চক্র,
তা’র ক্ষুর-ধারে কাটিল রে ফণী-ফণা বক্র।
তা’র ঘূর্ণন-প্রতিঘাত ভেঙে দেয় বিষ দাঁত,
সিন্ধু-ডাকাত ওরে ত্রাসে কাঁপে দিনরাত।
তারই নাগপাশ পরি’ কেঁদে মরে দুষমন।
ঘর্ঘর ঘোরে চাকা ঘরে ঘরে বন্‌ বন্‌।

লাঞ্ছিতা বঞ্চিতা দ্রৌপদী মা মোদের
ভয় নাই—তাকাবেনা মুখ-ছায়া আর ওদের
আজ তা'র দ্বারে আগমনী গাহে রণ-জাগরণী,
হবে না এ সজ্জায় লজ্জা কি নিবারণ ?
কে করিবে আর তা'র বস্ত্র অপহরণ ?
চরকা ! ঘোর তবে ঘর্ঘর বন বন

অনুখণ স্বন্ স্বন্ চরকা ! ঘোর ঘোর,
মুছুক সে ঘূর্ণনে জননীর আঁখি-লোর।
বাজুক সে-সুরে বাঁশি আস্যে ফুটুক হাসি,
দেশ-মা'র অঙ্গনে আজ তোরা দাঁড়া আসি'।
চরকা-সুতোয় হাতে মিলনের রাখী পর,
আজ ভাই ভাই এক ঠাঁই কেউ কারো নহে পর।
ওরে ও তরুণ দল কাঁপাইয়া ধরাতল
ছিঁড়িবারে কর পণ জননীর শৃঙ্খল।
তোরা আগুয়ান হ'রে তা'র ঘুচাইতে ক্রন্দন,
চরকা ! তক্‌লী ! ঘোর ঘর্ঘর বন্ বন্।

'রাখী' কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে

কয়েকটি অভিমত

Advance—* * * The poems deal with varied themes and their chief beauty lies in freshness and simplicity mingled with that touch of idealism which transcends the material and soars into the unknown. His poems breathe with hopeful thoughts ond ardent aspirations ; but the poet is not without doubts and discouragements. A tender melancholy strain, a depressing pessimism seem, therefore to prevade them all. They are however sweetest of the lot, because they happen to be the saddest.

বঙ্গবাণী—কবি বিভূতিভূষণের বয়সমাত্র ষোল বৎসর। এই বয়সে তিনি যে কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। প্রত্যেক কবিতার ছন্দ সুন্দর, বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর, এবং ভাবও মনোরম। আমরা এ কিশোর কবিকে সাদরে সাহিত্য ক্ষেত্রে আহ্বান করি।

Liberty—The poems are well-written and really charming, the more so, as they are written by a boy of sixteen only. The poet has got a sympathetic heart, able to analyse the joys and sorrows of the world. We find promise in his writing and trust that by culture he will win success in this line in future.

বিজলী—এই রাশি রাশি, অগণন কবি-প্রবাহের থেকে আমরা বিভূতি-ভূষণকে একটুখানি আলাদা করে দেখতে চাই। এ কিশোর-কবির একটা বেগ আছে যেটা চেষ্টাকৃত নয়, একটি আবেগ আছে যেটা স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত। ভাল কবিতা লিখবার চেষ্টা করলে, তিনি যে তা' পারবেন, তা'র প্রমাণ তাঁর 'কৈশোর-শেষে' 'হারিয়ে-যাওয়া পাখী' প্রভৃতি কবিতা।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট্, রায় বাহাদুর মহোদয় বলেন—শ্রীমান বিভূতি ভূষণের কয়েকটি কবিতা আমি পড়িয়াছি। ইহার বয়স অতি অল্প। এই বালক-কবির কবিতাগুলি আমার সত্যই ভাল লাগিয়াছে। * * * এত অল্প বয়সে এরূপ কবিতা লিখিতে পারায় যে গৌরব আছে, তাহা ইহাকে দিতে কেহ কুণ্ঠাবোধ করিবেন না।